বাংলাদেশের বাণিজ্য
(Trade of Bangladesh)

ইউনিট ১১

ভূমিকা

বাণিজ্য বলতে পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদানকে বুঝায় যার বিনিময় মূল্য থাকে। সাধারণত কোনো অঞ্চলে উদ্বৃত্ত পণ্য থাকলে সেখান থেকে ঘাটতি অঞ্চলে পণ্য সরবরাহ করা হয়। ধরণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী বাণিজ্যকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা- অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক বা বৈদেশিক বাণিজ্য। যখন কোনো দেশের অভ্যন্তরে বাণিজ্য সম্পন্ন করা হয় তখন তা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং যখন একদেশ থেকে অন্যদেশে পণ্যদ্রব্য আদান-প্রদান করা হয় তখন তা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা- রপ্তানি বাণিজ্য এবং আমদানি বাণিজ্য। বিশ্বের একেক দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য একেক ধরনের। বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের গতিপ্রকৃতি দেখলে বলা যায় যে, তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পজাত পণ্য, জনশক্তি, ঔষধ প্রভৃতি রপ্তানিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে, কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, মটরগাড়ি, জ্বালানি তেল, শিশুখাদ্যসহ ভোগ্যপণ্য, বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল প্রভৃতি আমদানি করা হয়। বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্কযুক্ত দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো চীন, ভারত, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি। তবে বাণিজ্যিক সম্পর্কযুক্ত প্রায় প্রতিটি দেশের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। তাই বাণিজ্য ঘাটতি পূরণে রপ্তানি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি খুবই জরুরি। এসব পণ্য আমদানি-রপ্তানিতে পোতাশ্রয় ও পশ্চাদভূমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১১.১ : বাণিজ্য ও প্রকারভেদ
পাঠ-১১.২ : বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য
পাঠ-১১.৩ : আমদানি পণ্য
পাঠ-১১.৪ : রপ্তানি পণ্য
পাঠ-১১.৫ : জনশক্তি রপ্তানি
পাঠ-১১.৬ : বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পোতাশ্রয় ও পশ্চাদভূমির ভূমিকা
পাঠ-১১.৭ : বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রধান বাণিজ্যিক দেশসমূহ
পাঠ-১১.৮ : বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব

পাঠ-১১.১ বাণিজ্য ও প্রকারভেদ (Trade and its Classification)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাণিজ্য বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন;
- বাণিজ্যের প্রকারভেদ সম্পর্কে জানবেন এবং
- অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।

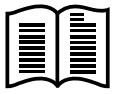

বাণিজ্য

মানব সমাজের প্রত্যেকেই একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। কোনো মানুষই নিজের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যাদি নিজে যেমন উৎপাদন করতে পারে না, ঠিক তেমনি কোনো অঞ্চলের অধিবাসীগণ নিজেদের প্রয়োজনীয় সব ধরনের দ্রব্যাদি উৎপাদন করতে পারে না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কোনো একজন মানুষ বা সমাজে বসবাসকারী মানুষগণ অন্যের উপর নির্ভরশীল। মানুষের এরূপ নির্ভরশীলতাই পণ্য সামগ্রীর আদান-প্রদানের প্রথা সূচনা করে। অর্থাৎ মানুষ তার অভাব বা চাহিদা পূরণের জন্য অন্যের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী গ্রহণ করে এবং নিজের উৎপাদিত অতিরিক্ত পণ্যসামগ্রী প্রদান করে। পণ্যের এরূপ আদান-প্রদানই হলো বাণিজ্য। বাণিজ্য সম্পাদনের জন্য পণ্যের বিনিময়মূল্য এবং কতিপয় আনুষঙ্গিক কার্যাবলি থাকে। মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম মাধ্যম বাণিজ্য।

বাণিজ্যের প্রকারভেদ : ধরণ এবং প্রকৃতির উপর নির্ভর করে বাণিজ্যকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য।

১. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য (Internal Trade) : কোনো একটি দেশের দুই বা ততোধিক অঞ্চলের মধ্যে যখন পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান হয়, তখন তাকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে। যেমন-পঞ্চগড় জেলা থেকে উত্তোলিত পাথর যখন দেশের বিভিন্ন জেলা বা অঞ্চলে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়, তখন তাকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে। এ ধরনের বাণিজ্যে সাধারণত সড়কপথ, নদীপথ বা রেলপথ ব্যবহার করা হয়।

২. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (International Trade) : যখন দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে পণ্যদ্রব্য আদান-প্রদান করা হয়, তখন তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। যেমন-বাংলাদেশের তৈরি পোশাক যুক্তরাজ্য, জার্মানি বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সাধারণত সমুদ্রপথ ব্যবহার করা হয়। তবে আকাশপথ, সড়কপথ বা রেলপথও ব্যবহার করা হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আমদানি ও রপ্তানি কার্য সম্পাদন হয় বলে একে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা- রপ্তানি বাণিজ্য এবং আমদানি বাণিজ্য।

ক. রপ্তানি বাণিজ্য (Export Trade) : যখন কোনো পণ্যদ্রব্য নিজ দেশ থেকে অন্য কোনো দেশে প্রেরণ করা হয়, তখন তাকে রপ্তানি বাণিজ্য বলে। যেমন-বাংলাদেশে থেকে তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার, পাট ও পাটজাত পণ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, চা, ঔষধ প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয়।

খ. আমদানি বাণিজ্য (Import Trade) : অন্য কোনো দেশ থেকে যখন পণ্যদ্রব্য নিজ দেশে আনা হয়, তখন তাকে আমদানি বাণিজ্য বলে। যেমন-বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে যন্ত্রপাতি, ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য, জ্বালানি তেল, কয়লা, খাদ্যসহ বিভিন্ন পণ্য আমদানি করে থাকে।

অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পার্থক্য : অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে কতিপয় মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। উল্লেখযোগ্য পার্থক্যসমূহ নিম্নে দেখানো হলো।

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পার্থক্য

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য	আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য একটি দেশের অভ্যন্তরে সম্পাদিত হয়।	আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে সম্পাদিত হয়।
অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে পণ্যদ্রব্য সহজেই দেশের যে কোনো স্থানে পাঠানো যায়।	আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কতিপয় নিয়মকানুন (যেমন- শুল্ক) মেনে চলতে হয়ে।
এ ধরনের বাণিজ্যে দেশে প্রচলিত মুদ্রা (যেমন-টাকা) দিয়ে সম্পাদন করা হয়।	এ ধরনের বাণিজ্যে আন্তর্জাতিক মুদ্রায় (যেমন- ডলার) সম্পাদন করতে হয়।
অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের সামঞ্জস্য থাকে।	আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিভিন্ন ধরনের পণ্যদ্রব্যের চাহিদা থাকে। এক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থান, ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক সক্ষমতা এবং আন্তর্জাতিক চাহিদা প্রভাবিত করে।
অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বাজার ব্যবস্থা প্রায় একই রকম থাকে।	আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাজার ব্যবস্থা চাহিদার উপর নির্ভর করে।
অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে সরকারের গৃহীত নীতিমালার আলোকে সম্পাদন করা হয়।	আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

শিক্ষার্থীর কাজ | কোনটি কোন ধরনের বাণিজ্য তা লিখুন।

পণ্যদ্রব্য আদান-প্রদানের ধরণ	বাণিজ্যের ধরণ
পঞ্চগড় থেকে চট্টগ্রাম	
বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাজ্য	
জার্মানি থেকে বাংলাদেশ	

সারসংক্ষেপ

বাণিজ্য হলো পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান। এর মাধ্যমে কোনো অঞ্চলের উদ্বৃত্ত পণ্যদ্রব্য ঘাটতি অঞ্চলে সরবরাহ করা হয়। ধরণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী বাণিজ্য প্রধানত দুই প্রকার। যথা-অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য একটি দেশের অভ্যন্তরে হয়ে থাকে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা-আমদানি বাণিজ্য এবং রপ্তানি বাণিজ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ধরণ এবং প্রকৃতি অনুযায়ী বাণিজ্য প্রধানত কত প্রকার?
(ক) দুই (খ) তিন (গ) চার (ঘ) পাঁচ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২ থেকে ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

জনাব রফিক একজন কৃষক। তিনি জমিতে উৎপাদিত ফসল নিজের চাহিদা মিটিয়ে অতিরিক্ত পণ্য বাজারে বিক্রি করেন। কিন্তু জমি চাষের জন্য আধুনিক যন্ত্র নিজে তৈরি করতে পারেন না। ফলে বাজার থেকে জমি চাষের জন্য একটি ট্রাক্টর কিনলেন।

২। উদ্দীপকে সম্পাদিত কর্মটি কী নির্দেশ করছে?
(ক) দান (খ) বাণিজ্য (গ) ট্রাস্ট গঠন (ঘ) চুক্তি

৩। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উদাহরণ হলো-
i. পঞ্চগড় থেকে ঢাকায় পণ্যদ্রব্য প্রেরণ
ii. চট্টগ্রাম থেকে রাজশাহীতে পণ্যদ্রব্য প্রেরণ
iii. বাংলাদেশ থেকে জার্মানিতে পণ্যদ্রব্য প্রেরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। ভারত থেকে জমি চাষের ট্রাক্টর আমদানি কোন ধরনের বাণিজ্য?
(ক) অভ্যন্তরীণ (খ) আন্তর্জাতিক (গ) ক ও খ সঠিক (ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ-১১.২ বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Foreign Trade of Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিধিও ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ক্রয় সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি বৈদেশিক বাণিজ্যের গতিশীলতা বৃদ্ধি করছে। ফলশ্রুতিতে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে। নিম্নে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করা হলো:

১. তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার পণ্য রপ্তানি : পূর্বে বাংলাদেশের রপ্তানিতে কৃষিজাত কাঁচামাল ও পণ্যদ্রব্যের প্রাধান্য থাকলেও বিগত কয়েক বছরে এ দৃশ্য ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৩৪,২৫৭ মিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয়ের মধ্যে ২৮,০৯৪ মিলিয়ন ডলার আয় হয় শুধুমাত্র তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার পণ্য রপ্তানি করে। যা মোট রপ্তানি আয়ের ৮২.০১%।

২. কাঁচামাল ও কৃষিজাত পণ্যদ্রব্য রপ্তানি : কৃষি প্রধান বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য হলো কৃষিজাত কাঁচামাল ও কৃষিভিত্তিক শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য রপ্তানি। যেমন-পাট ও পাটজাত পণ্য, চা, মৎস্য, তামাক প্রভৃতি রপ্তানি করা হয়। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কৃষিজাত কাঁচামাল এবং পণ্যদ্রব্য থেকে আসে।

৩. শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য আমদানি : বাংলাদেশের আমদানি ব্যয়ের বেশির ভাগ শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য আমদানিতে ব্যবহৃত হয়। শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের কাঁচামালের স্বল্পতা আমদানি বৃদ্ধির মূল কারণ। আমদানিকৃত শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের মধ্যে কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, রেডিও, টেলিভিশন, মোটরগাড়ি, লৌহ ও ইস্পাত, রাসায়নিক দ্রব্যাদি অন্যতম।

৪. খাদ্যশস্য ও ভোগ্যপণ্য আমদানি : বাংলাদেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করলেও বিভিন্ন সময়ে প্রতিকূল প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ধান, গমসহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়। এছাড়া শিশুখাদ্য ও অন্যান্য ভোগ্য পণ্য আমদানি বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৫. জ্বালানি ও ভোজ্য তেল আমদানি : বাংলাদেশে জ্বালানি ও ভোজ্য তেলের পর্যাপ্ত উৎস না থাকায় প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে আমদানি করতে হয়। ফলে এ খাতে বৈদেশিক মুদ্রার একটি বৃহৎ অংশ ব্যয় করতে হয়। যা সামগ্রিকভাবে পরিবহনসহ প্রায় সকল খাতকে প্রভাবিত করে।

৬. আমদানি পণ্যদ্রব্যের আধিক্য : বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো আমদানিকৃত পণ্যদ্রব্যের আধিক্য। বাংলাদেশ যে পরিমাণ পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করে তার চেয়ে অধিক পরিমাণে আমদানি করে। শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের অপর্যাপ্ততা অধিক সংখ্যক পণ্যদ্রব্য আমদানির নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

৭. জনশক্তি রপ্তানি : বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিপুল পরিমাণ জনশক্তি রপ্তানি করে থাকে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রবাসীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৬.৮৫ লক্ষ জন এবং প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৪,৯৩১ মিলিয়ন ডলার যা জিডিপির শতকরা প্রায় ৬.৮ ভাগ। বাংলাদেশের জনশক্তির অধিকাংশই মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয়।

৮. প্রতিকূল বাণিজ্য শর্ত : বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো বিভিন্ন সময়ে প্রতিকূল বাণিজ্য শর্ত। যেহেতু বিভিন্ন ধরনের শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য আমদানি করতে হয় এবং এ সকল পণ্যদ্রব্যের চাহিদা স্থিতিশীল থাকে না, সেহেতু বাণিজ্য শর্ত অনেক সময় বাংলাদেশের প্রতিকূলে থাকে।

৯. লেনদেনে প্রতিকূল ভারসাম্য : বৈদেশিক বাণিজ্যকে গতিশীল করার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে (যেমন-বিদেশি ঋণের সুদ, জাহাজ ভাড়া, বীমার প্রিমিয়াম, ভ্রমণ ব্যয় প্রভৃতি) প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করতে হয়। এসব কারণে বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্যে প্রতিকূল অবস্থা বিরাজ করে।

১০. বাণিজ্যে ঘাটতি : বাংলাদেশ যেসব দেশ থেকে পণ্যদ্রব্য আমদানি করে সেসব দেশের সাথে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। যেমন- বাংলাদেশ চীন বা ভারতে যে পরিমাণ পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করা হয় তার চেয়ে অনেক বেশি আমদানি করে। তবে সরকার বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এ কারণে নতুন নতুন পণ্য রপ্তানির প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

১১. বিদেশী জাহাজ ও বীমা কোম্পানির উপর নির্ভরশীলতা : বাংলাদেশের পর্যাপ্ত সামুদ্রিক জাহাজ না থাকায় পণ্যদ্রব্য পরিবহনের জন্য বিদেশী জাহাজের উপর নির্ভর করতে হয়। যা পণ্যদ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি ব্যয় বৃদ্ধি করে। এছাড়া দেশীয় বীমা কোম্পানির স্বল্পতার কারণে বিদেশী বীমা কোম্পানির উপর নির্ভর করতে হয়। ফলে দেশের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে বিদেশী বীমা কোম্পানির উপর নির্ভর করতে হয়।

১২. ওয়েজ আর্নারস স্কিমের অধীনে আমদানি : বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ওয়েজ আর্নারস স্কিম প্রবর্তন করা হয়েছে। এ স্কিমের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশীদের কষ্টার্জিত মুদ্রা দ্বারা বিদেশ থেকে পণদ্রব্য আমদানি করা হয়।

১৩. বিলাসী পণ্যদ্রব্য আমদানি হ্রাস : সরকার বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় রোধে বিলাসী পণ্যদ্রব্য আমদানি নিরুৎসাহিত করছে। এছাড়া সরকার বিলাসী পণ্যদ্রব্যের পরিবর্তে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্য আমদানিকে অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

১৪. সমুদ্রপথে বাণিজ্য অগ্রাধিকার : বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে সমুদ্রপথেই অধিকাংশ বাণিজ্য সম্পাদন করা হয়। তবে প্রতিবেশী ভারত, মিয়ানমার, নেপালের সাথে সড়কপথেও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করা হয়। বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৫. প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক : বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রাখা। যা প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে বাণিজ্যিক সর্ম্পক জোরদারের পাশাপাশি আন্তঃসম্পর্ক বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৬. সরকারি নীতি : আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাণিজ্য নীতি নিয়ত পরিবর্তনশীল। সরকার পণ্যদ্রব্য রপ্তানিতে সরকারি পর্যায়ের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকে অধিক উৎসাহিত করছে। একই সাথে আমদানি বাণিজ্য হ্রাস করার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। সরকার বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্য বিভিন্ন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। এ সকল চুক্তির মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য এলাকা চুক্তি (সাফটা), সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস (সাটিস), এশিয়া প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট (আপটা), এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড প্রিফারেনশিয়াল সিস্টেম-ওআইসি, ডেভেলপিং-৮, বিসসটেক, ফ্রি ট্রেড এরিয়া (এফটিএ) প্রভৃতি।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ৫টি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার বৃদ্ধির ফলে আমদানি-রপ্তানির পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে বৈচিত্র্যতা আসছে। যদিও বাংলাদেশের রপ্তানির তুলনায় আমদানিকৃত পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ অধিক। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রপ্তানি বাণিজ্যে তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ আসে এ খাত থেকে। এছাড়া বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে জনশক্তি রপ্তানি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মূলত শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য, যন্ত্রপাতি, শিশুখাদ্যসহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্যশস্য আমদানি করে থাকে। অন্যদিকে, কৃষিজাত পণ্য ও কাঁচামাল, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, হিমায়িত খাদ্যসামগ্রী প্রভৃতি রপ্তানি করা হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশ রপ্তানি করে-
i. পাট ও পাটজাত পণ্য ii. চা iii. চামড়া
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য কোনটি?
(ক) তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার (খ) চা (গ) পাট (ঘ) তামাক

৩। বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য হলো-
i. শিল্পজাত পণ্য আমদানি ii. শিশু খাদ্য রপ্তানি iii. কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান যোগাযোগ মাধ্যম কোনটি?
(ক) সড়কপথ (খ) সমুদ্রপথ (গ) রেলপথ (ঘ) আকাশপথ

পাঠ-১১.৩ আমদানি পণ্য (Import Goods)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের প্রধান আমদানি পণ্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- আমদানি ব্যয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

আমদানি পণ্য

আমরা পূর্বের পাঠে জেনেছি যে, আমদানি বলতে দেশের জনগণের প্রয়োজনে যেসব পণ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল বিদেশ থেকে ক্রয় করা হয় সেগুলোকে বুঝায়। বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠির প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করা দেশীয় উৎপাদন দ্বারা সম্ভব হয় না। জনগণের চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য, কাঁচামাল, উন্নয়ন সামগ্রী, খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি আমদানি করতে হয়। বাংলাদেশের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার একটি বৃহৎ অংশ পণ্য আমদানিতে ব্যয় হয়। বিদেশ থেকে যেসব পণ্য আমদানি করা হয় নিম্নে তার বিবরণ দেওয়া হলো:

১. খাদ্যদ্রব্য : কৃষি প্রধান বাংলাদেশ ধান উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করলেও বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য আমদানি করতে হয়। অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের জন্য প্রতি বছর চাল, গম ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য আমদানি করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১১২ মিলিয়ন ডলারের চাল এবং ৯৪৫ মিলিয়ন ডলারের গম আমদানি করতে হয়েছে। বাংলাদেশ প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইউক্রেন, ভারত, যুক্তরাজ্য, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশ থেকে চাল ও গম আমদানি করে। এছাড়া প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে শিশুখাদ্য আমদানি করা হয়।

২. শিল্পের যন্ত্রপাতি : বাংলাদেশ শিল্পের যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ বাবদ প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে থাকে। প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীন, যুক্তরাজ্য, জাপান, জার্মানি, কানাডা, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে শিল্পের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি করা হয়।

৩. তুলা ও সুতা : বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার শিল্পের জন্য কাঁচামাল হিসেবে প্রচুর পরিমাণে তুলা ও সুতা আমদানি করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১,৯৫৯ মিলিয়ন ডলারের তুলা এবং ১,৯৫৯ মিলিয়ন ডলারের সুতা আমদানি করা হয়।

৪. শিল্পের কাঁচামাল : শিল্প-কারখানার উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য তুলা, সুতা ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের কাঁচামাল আমদানি করতে হয়। এসব কাঁচামালের মধ্যে কয়লা, আকরিক লৌহ, তামা, সীসা, রাবার অন্যতম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, কানাডা, ভারত, চীন, প্রভৃতি দেশ থেকে এসব কাঁচামাল আমদানি করা হয়।

৫. পরিবহন সামগ্রী ও যন্ত্রাংশ : বাংলাদেশ শিল্পে উন্নত না হওয়ার ফলে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণে পরিবহন সামগ্রী ও যন্ত্রাংশ আমদানি করতে হয়। এসবের মধ্যে রয়েছে মোটরগাড়ি, বাস, ট্রাক, জীপ, কলের লাঙ্গল, জাহাজ, বিমান এবং এসবের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ। সাধারণত চীন, ভারত, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, কানাডা প্রভৃতি দেশ থেকে এসব পণ্যসামগ্রী আমদানি করা হয়।

৬. কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন : সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাবলেড, মোবাইল ফোন, মাল্টিমিডিয়া প্রভৃতির ব্যবহার বহুগুণে বেড়ে গেছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এসবের ব্যবহার পৌঁছে যাওয়ায় আমদানির পরিমাণও বেড়ে গেছে। এসব পণ্যদ্রব্য আমদানিতে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয়।

৭. বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি : অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের জন্য বিপুল পরিমাণে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি আমদানি করা হয়। এসব সরঞ্জামের মধ্যে বৈদ্যুতিক তার, সুইচ, সুইচ বোর্ড, ফ্যান, রেগুলেটর, রেডিও, টেলিভিশন, ফ্রিজ, এয়ারকুলার, এয়ার কন্ডিশনার, ওভেন অন্যতম। প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, যুক্তরাজ্য, জাপান, রাশিয়া, নেদারল্যান্ডস প্রভৃতি দেশ থেকে এসব সরঞ্জামাদি আমদানি করা হয়।

৮. সার : দেশের কৃষিক্ষেত্রে সারের চাহিদা পূরণের জন্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের পাশাপাশি বিশ্ব বাজার থেকেও আমদানি করা হয়। এসব সারের মধ্যে রয়েছে ইউরিয়া, টিএসপি প্রভৃতি। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১,১১২ মিলিয়ন ডলারের সার আমদানি করা হয়েছে।

৯. ভোজ্য ও তৈলবীজ : বাংলাদেশ প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ ভোজ্য তেল ও তৈলবীজ আমদানি করে থাকে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১,৪৩৬ মিলিয়ন ডলারের ভোজ্য তেল এবং ৫৩২ মিলিয়ন ডলারের তৈলবীজ আমদানি করা হয়।

১০. খনিজ তেল : অভ্যন্তরীণ জ্বালানি চাহিদা পূরণের জন্য বিশ্ববাজার থেকে বিপুল পরিমাণে খনিজ তেল আমদানি করতে হয়। সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, মিয়ানমার প্রভৃতি দেশ থেকে কেরোসিন, পেট্রোলিয়াম, অশোধিত তেল আমদানি করা হয়।

১১. ক্লিংকার : বাংলাদেশ ক্লিংকার উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়ায় দক্ষিণ কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, ভারত প্রভৃতি দেশ থেকে আমদানি করে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ক্লিংকার আমদানিতে ব্যয় হয় ৫৭১ মিলিয়ন ডলার।

১২. অন্যান্য দ্রব্যসমূহ : উপরিউক্ত পণ্যদ্রব্যসমূহ ছাড়াও ঔষধ, বইপত্র, ম্যাগাজিন, রাবার ও রাবারজাত দ্রব্যাদি, মূল্যবান পোশাক, তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যাদি, কয়লা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে আমদানি করা হয়।

সারণি ১১.৩.১ : পণ্যভিত্তিক আমদানি ব্যয়ের চিত্র (মিলিয়ন ডলার)

পণ্যদ্রব্য	২০১৫-১৬ অর্থবছর	পণ্যদ্রব্য	২০১৫-১৬ অর্থবছর
চাল	১১২	সার	১,১১২
গম	৯৪৫	ক্লিংকার	৫৭১
তৈলবীজ	৫৩২	স্টেপল ফাইবার	১,১৭২
অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	৩৮৪	সুতা	১,৯৫৯
কাঁচা তুলা	১,৯৫৯	মূলধনী যন্ত্রসামগ্রী	৩,৩৯৯
ভোজ্য তেল	১,৪৩৬	অন্যান্য পণ্য	২৭,০৮৪
পেট্রোলিয়াম সামগ্রী	২,২৫৬		
মোট	**৪২,৯২১**		

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭ (পৃ. ৩০১)

পণ্য আমদানি ব্যয় : বাংলাদেশের পণ্য আমদানি ব্যয়ের চিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ছিল ১৭,১৫৭ মিলিয়ন ডলার। মাত্র কয়েক বছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৪২,৯২১ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। অর্থনৈতিকভাবে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার ফলে পণ্য আমদানির সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের জন্য পণ্য আমদানি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি রপ্তানি আয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি করতে হবে।

সারণি ১১.৩.২ : বিগত কয়েকটি অর্থবছরে পণ্য আমদানি ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র

অর্থবছর	আমদানি ব্যয় (মিলিয়ন ডলার)
২০০৬-০৭	১৭,১৫৭
২০০৭-০৮	২১,৬২৯
২০০৮-০৯	২২,৫০৭
২০০৯-১০	২৩,৭৩৮
২০১০-১১	৩৩,৬৫৮
২০১১-১২	৩৫,৫১৬
২০১২-১৩	৩৪,০৮৪
২০১৩-১৪	৪০,৭৩২
২০১৪-১৫	৪০,৭০৪
২০১৫-১৬	৪২,৯২১

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭ (পৃ. ৩০১)

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের প্রধান আমদানি পণ্যসমূহের একটি তালিকা করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন এবং শিল্পের কাঁচামালসহ অন্যান্য দ্রব্যাদির ঘাটতি থাকায় প্রতি বছর বিপুল পরিমাণে পণ্যসামগ্রী বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। আমদানিকৃত পণ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো খাদ্যদ্রব্য, শিল্পের যন্ত্রপাতি, তুলা, সুতা, শিল্পের কাঁচামাল, পরিবহন সামগ্রী ও যন্ত্রাংশ, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, সার, ক্লিংকার, ভোজ্য তেল ও তেলবীজ, খনিজ তেল প্রভৃতি। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে পণ্য আমদানি ব্যয় ছিল মাত্র ১৭.১৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ৪২,৯২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। দেশে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নতির ফলে বিভিন্ন পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে যা আমদানি বৃদ্ধির নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশ আমদানি করে-

i. ভোজ্য তেল ii. খনিজ তেল iii. গম

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে পণ্যের আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ কত ছিল?

(ক) ৪২,৯২১ মিলিয়ন ডলার (খ) ৪৪,০৮৪ মিলিয়ন ডলার

(গ) ৪৬,৭৩২ মিলিয়ন ডলার (ঘ) ৪৮,৫১৬ মিলিয়ন ডলার

৩। খনিজ তেল আমদানি করা হয় কোন দেশ থেকে?

(ক) সৌদি আরব (খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (গ) রাশিয়া (ঘ) চীন

৪। ক্লিংকার আমদানি করা হয় কোন দেশ থেকে?

(ক) ইন্দোনেশিয়া (খ) জাপান (গ) ভারত (ঘ) সবগুলো সঠিক

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের জন্য অনেকগুলো পণ্যদ্রব্য দেশের বাইরে থেকে ক্রয় করতে হয়। যেমন- অবকাঠামোগত উন্নয়নে লৌহ ও ইস্পাত আবশ্যকীয় উপাদান যা বিদেশ থেকে নিয়ে আসা হয়। এজন্য বৈদেশিক মুদ্রার একটি বড় অংশ ব্যয় করতে হয়।

৫। উদ্দীপকে উল্লিখিত লৌহ ও ইস্পাত ক্রয় কোন ধরনের কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত?

(ক) অভ্যন্তরীণ (খ) আমদানি (গ) রপ্তানি (ঘ) সবগুলো সঠিক

৬। বাংলাদেশ পরিবহন সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি আমদানি করে-

i. জাপান ii. ভারত iii. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১১.৪ রপ্তানি পণ্য (Export Goods)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- পণ্য রপ্তানি আয় সম্পর্কে জানতে পারবেন।

রপ্তানি পণ্য

পূর্বে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে রপ্তানি পণ্য হিসেবে কৃষি ও কৃষিভিত্তিক শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যই মুখ্য ভূমিকা পালন করতো। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রপ্তানি বাণিজ্যে বৈচিত্র্যতা এসেছে। বাংলাদেশ থেকে যেসব পণ্য রপ্তানি করা হয় সেগুলো প্রধানত দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- প্রচলিত রপ্তানি পণ্য এবং অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য।

ক. প্রচলিত রপ্তানি পণ্য (Traditional Export Goods) : বাংলাদেশ থেকে দীর্ঘকাল যাবৎ যেসব পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়, সেগুলোকে প্রচলিত রপ্তানি পণ্য বলে। প্রচলিত রপ্তানি পণ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো পাট ও পাটজাত পণ্য, চা, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য প্রভৃতি।

খ. অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য (Non-Traditional Export Goods) : সাম্প্রতিককালে যেসব পণ্য বাংলাদেশ থেকে বিদেশে রপ্তানি শুরু হয়েছে, সেসব পণ্যকে অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য বলে। বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে অপ্রচলিত পণ্যের পরিমাণ এবং সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে রপ্তানি আয়ের সিংহভাগই আসে অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানি করে। অপ্রচলিত পণ্যসমূহের মধ্যে তৈরি পোশাক এবং নীটওয়্যার অন্যতম। অপ্রচলিত অন্যান্য পণ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে হিমায়িত খাদ্যসামগ্রী, হস্তশিল্পজাত পণ্যদ্রব্য, কৃষিপণ্য, সার ও রাসায়নিক দ্রব্য, সিরামিক, ঔষধ প্রভৃতি।

রপ্তানি পণ্য ও আয়ের পরিমাণ : বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার, হিমায়িত খাদ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, ঔষধ প্রভৃতি। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ৩৪,২৫৭ মিলিয়ন ডলার। নিম্নে উল্লেখযোগ্য রপ্তানি পণ্যসমূহ আলোচনা করা হলো:

১. তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার : বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭৬ সাল থেকে তৈরি পোশাক রপ্তানি পণ্যের তালিকায় যুক্ত হয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান মাধ্যম। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তৈরি পোশাক রপ্তানি করে ১৪,৭৩৯ মিলিয়ন ডলার আয় হয় যা মোট রপ্তানি আয়ের ৪৩.০২%। এদেশের তৈরি পোশাক তুলনামূলক সস্তা এবং গুণগত মানসম্পন্ন হওয়ায় বিদেশে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের মধ্যে জিন্সপ্যান্ট, ট্রাউজার, শার্ট, টি শার্ট, প্যান্ট, স্কার্ট, টপস, সোয়েটার, জ্যাকেট, পুলওভার, কার্ডিগান, ব্লাউজ অন্যতম। অন্যদিকে, নীটওয়্যার পণ্য রপ্তানিতেও বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে নীটওয়্যারের রপ্তানি আয় ছিল ১৩,৩৫৫ মিলিয়ন ডলার যা মোট রপ্তানি আয়ের ৩৮.৯৯%। অর্থাৎ রপ্তানি আয়ে তৈরি পোশাক এবং নীটওয়্যার শিল্পের মোট অবদান ৮২.০১%। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, কানাডা, বেলজিয়াম, স্পেন প্রভৃতি দেশ তৈরি পোশাকের প্রধান ক্রেতা।

২. হিমায়িত খাদ্য সামগ্রী : বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যসমূহের মধ্যে হিমায়িত খাদ্যসামগ্রী অন্যতম। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে হিমায়িত খাদ্যসামগ্রী রপ্তানি করে আয় হয় ৫৩৬ মিলিয়ন ডলার যা রপ্তানি আয়ের ১.৫৬%। হিমায়িত খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে টাটকা মাছ, ব্যাঙের পা, মাছজাত দ্রব্য প্রভৃতি। ভারত, মিয়ানমার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মধ্যপ্রাচ্যে হিমায়িত খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে মাছ ও মাছজাত দ্রব্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, জাপান, কানাডা, ইতালি প্রভৃতি দেশে ব্যাঙের পা রপ্তানি করা হয়।

৩. কাঁচাপাট ও পাটজাত পণ্য : একসময় বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের মধ্যে কাঁচাপাট ও পাটজাত পণ্যের অবস্থান ছিল প্রথম। কিন্তু তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার শিল্প দ্রুত বিকাশ লাভ করায় কাঁচাপাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে পিছিয়ে পড়ে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কাঁচাপাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে আয় হয় ৯২০ মিলিয়ন ডলার (কাঁচাপাট ১৭৩ মিলিয়ন ডলার এবং পাটজাত পণ্য ৭৪৭ মিলিয়ন ডলার) যা রপ্তানি আয়ের মাত্র ২.৬৮%। ভারত, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে কাঁচাপাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি করা হয়। পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা ও মূল্য একসময় হ্রাস পেতে থাকলেও পরিবেশ বান্ধব হওয়ায় সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ব বাজারে পুনরায় পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা এবং আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। পাট শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ঘোষিত 'শিল্পনীতি আদেশ-২০১০' এ পাটজাত পণ্যকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসাব চিহ্নিত করা হয়েছে যা এই শিল্পের পুনঃবিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৪. চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য : চামড়া শিল্পে বাংলাদেশ যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে। রপ্তানি পণ্যসমূহের মধ্যে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য অন্যতম। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করে ১,১৬১ মিলিয়ন ডলার আয় হয় যা রপ্তানি আয়ের ৩.৪০%। ভারত, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, জার্মানি পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, জাপান ইতালি প্রভৃতি দেশ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের প্রধান ক্রেতা।

৫. রাসায়নিক ও ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য : বাংলাদেশ সীমিত পরিসরে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক ও ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য রপ্তানি করে থাকে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১২৪ মিলিয়ন ডলারের রাসায়নিক দ্রব্য এবং ৫১০ মিলিয়ন ডলারের ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য রপ্তানি করে যা রপ্তানি আয়ের ১.৮৫%।

৬. কৃষিজ পণ্য : বাংলাদেশ কাঁচাপাট ও পাটজাত পণ্য, চা ছাড়াও বিভিন্ন কৃষিজ পণ্য রপ্তানি করে থাকে। এসব কৃষিজ পণ্যের মধ্যে রয়েছে শাকসবজি, ফলমূল, মাছ, পান-সুপারি, গোল আলু, মসলা প্রভৃতি। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কৃষিজ পণ্য রপ্তানি করে ৩০৯ মিলিয়ন ডলার আয় হয় যা রপ্তানি আয়ের ০.৯০%।

৭. ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল : সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের তালিকায় ঔষধ শিল্প যুক্ত হয়েছে। বর্তমানে ৪৬টি ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল রপ্তানি করে থাকে। বাংলাদেশে উৎপাদিত ঔষধ বিশ্ববাজারে ক্রমশ অবস্থান বিস্তৃত করছে। বাংলাদেশ ১২৭টি দেশে ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল রপ্তানি করেছে যা ২০০৫ সালে ছিল মাত্র ৬৭টি দেশে। তবে রপ্তানিকৃত ঔষধের পরিমাণ অতি অল্প।

উপরিউক্ত পণ্যসমূহ ছাড়াও চা, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, পেট্রোলিয়াম পণ্য, চিটাগুড়, অশোধিত সার, দেয়াশলাই, পারটেক্স, রেয়ন প্রভৃতি রপ্তানি করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকা থেকে যেসব পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হয় সেসব পণ্যের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের উন্নয়নে রপ্তানি পণ্যের বিশেষ অবদান রয়েছে। বাংলাদেশে রপ্তানিযোগ্য খনিজ সম্পদ না থাকায় আবহমানকাল থেকে বিভিন্ন কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। তবে ১৯৭৬ সাল থেকে তৈরি পোশাক রপ্তানি ক্ষেত্রে যে যাত্রা শুরু করে তা ক্রমেই প্রসারিত হতে থাকে। এর সাথে নীটওয়্যার শিল্পও সমভাবে বিকশিত হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার পণ্য রপ্তানি আয় ছিল ২৮,০৯৪ মিলিয়ন ডলার যা রপ্তানি আয়ের ৮২.০১%। এরপরই রয়েছে হিমায়িত খাদ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, কাঁচাপাট ও পাটজাত পণ্য, রাসায়নিক ও ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, কৃষিজ পণ্য এবং অন্যান্য পণ্যসামগ্রী। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রপ্তানি পণ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকায় রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যসমূহকে কতভাগে ভাগ করা যায়?

(ক) দুই (খ) তিন (গ) চার (ঘ) পাঁচ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২ থেকে ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

পূর্বে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল কৃষিভিত্তিক শিল্পজাত পণ্য রপ্তানি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নতুন একটি শিল্প এ স্থান অর্জন করেছে। যা রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ অবদান রাখে।

২। উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রধান রপ্তানি পণ্যটির নাম কী?

(ক) তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার (খ) চা (গ) চাল (ঘ) চামড়া

৩। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ কত ছিল?

(ক) ২৪,৩০২ মিলিয়ন ডলার (খ) ২৭,০২৭ মিলিয়ন ডলার
(গ) ৩০,১৭৭ মিলিয়ন ডলার (ঘ) ৩৪,২৫৭ মিলিয়ন ডলার

৪। প্রচলিত রপ্তানি পণ্য-

i. পাট ও পাটজাত পণ্য ii. ঔষধ iii. চা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১১.৫ জনশক্তি রপ্তানি (Manpower Export)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিদেশে কর্মরত শ্রমশক্তির সংখ্যা ও প্রেরিত অর্থের পরিমাণ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- বহির্বিশ্বে বাংলাদেশী জনশক্তির চাহিদা বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধিতে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

জনশক্তি রপ্তানি

জনবহুল বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি বেকারত্ব হ্রাস, দারিদ্র বিমোচন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে জনশক্তি রপ্তানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ১৯৭৬ সাল থেকে বিশ্বের শ্রমবাজারে সক্রিয় অংশগ্রহণের পর থেকেই জনশক্তি রপ্তানি ও প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৭৬ সালে বিদেশগামী জনশক্তির সংখ্যা ছিল মাত্র ৬,০৮৭ জন যা ২০১৬ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৭,৫৭,৭৩১ জন।

শ্রেণিভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি : বাংলাদেশ বিভিন্ন ক্যাটাগরির জনশক্তি বিদেশে রপ্তানি করে থাকে। যেমন-পেশাজীবী, দক্ষ, আধা-দক্ষ, স্বল্প দক্ষ। রপ্তানিকৃত এসব জনশক্তি যোগ্যতা এবং কর্মদক্ষতা অনুযায়ী বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত থাকে। বাংলাদেশের শ্রেণিভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানিতে আধা-দক্ষ এবং স্বল্প দক্ষ জনশক্তির আধিক্য দেখা যায় (সারণি ১১.৫.১)।

সারণি ১১.৫.১ : শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী জনশক্তির সংখ্যা

সাল	পেশাজীবী	দক্ষ	আধা-দক্ষ	স্বল্পদক্ষ	মোট
২০১২	৮১২	২,০৯,৩৬৮	২০,৪৯৮	৩,৭৭,১২০	৬,০৭,৭৯৮
২০১৩	৬৮৯	১,৩৩,৭৫৪	৬২,৫২৮	২,১২,২৮২	৪,০৯,২৫৩
২০১৪	১,৭৩০	১,৪৮,৭৬৬	৭০,০৯৫	১,৯৩,৪০৩	৪,২৫,৬৮৪
২০১৫	১,৮২৮	২,১৪,৩২৮	৯১,০৯৯	২,৪৮,৬২৬	৫,৫৫,৮৮১
২০১৬	৪,৬৩৮	৩,১৮,৮৫১	১,১৯,৯৪৬	৩,১৪,২৯৬	৭,৫৭,৭৩১

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭ (পৃ. ৩৩)

সারণি ১১.৫.১ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পেশাজীবীর সংখ্যা খুব ধীর গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধিক সংখ্যক দক্ষ ও পেশাজীবী জনশক্তি রপ্তানি করতে পারলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে দ্রুত অগ্রগতি হবে এবং সংশ্লিষ্ট পরিবারসমূহ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্র প্রসারিত হবে।

দেশভিত্তিক জনশক্তির সংখ্যা : বাংলাদেশের প্রবাসী জনশক্তি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন পেশায় কর্মরত। অধিকাংশ জনশক্তি ওমান, সৌদি আরব, কাতার, বাহরাইন, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, কুয়েত প্রভৃতি দেশে কর্মরত। এছাড়া লেবানন, জর্ডান, ইউএই, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রুনাই, মরিসাস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইতালি প্রভৃতি দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনশক্তি কর্মরত রয়েছে। সারণি ১১.৫.২. এ দেশভিত্তিক প্রবাসী জনশক্তির সংখ্যা দেখানো হলো-

সারণি ১১.৫.২ : দেশভিত্তিক প্রবাসী জনশক্তির সংখ্যা (২০১৫)

দেশ	প্রবাসীর সংখ্যা	দেশ	প্রবাসীর সংখ্যা	দেশ	প্রবাসীর সংখ্যা
ওমান	১,৮৮,২৪৭	বাহরাইন	৭২,১৬৭	কুয়েত	৩৯,১৮৮
সৌদি আরব	১,৪৩,৯১৩	সিঙ্গাপুর	৫৪,৭৩০	লেবানন	১৫,০৯৫
কাতার	১,২০,৩৮২	মালয়েশিয়া	৪০,১২৬	অন্যান্য দেশ	৮৩,৮৮৩
মোট	**৭,৫৭,৭৩১ জন**				

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭ (পৃ. ৩৪)

বিদেশে কর্মরত জনশক্তি কর্তৃক প্রেরিত অর্থের পরিমাণ : বিদেশে কর্মরত জনশক্তি কর্তৃক প্রেরিত অর্থ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিদেশে কর্মরত জনশক্তি কর্তৃক প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ছিল ১৪,৯৩১ মিলিয়ন ডলার যা ২০১১-১২ অর্থবছরে ছিল ১২,৮৪৩.৪০ মিলিয়ন ডলার। সারণি ১১.৫.৩ এ প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ এবং জিডিপির শতকরা হার দেখানো হলো।

সারণি : ১১.৫.৩ : প্রবাসী কর্মজীবীর প্রেরিত অর্থের পরিমাণ এবং জিডিপির শতকরা হার

অর্থবছর	প্রেরিত অর্থের পরিমাণ (মিলিয়ন ডলার)	জিডিপির শতকরা হার (%)
২০১১-১২	১২,৮৪৩.৪০	৯.৬৩
২০১২-১৩	১৪,৪৬১.১৫	৯.৬৪
২০১৩-১৪	১৪,২২৮.৩০	৮.২৩
২০১৪-১৫	১৫,৩১৬.৯১	৭.৯৬
২০১৫-১৬	১৪,৯৩১.০০	৬.৭৬

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭ (পৃ. ৩৩ এবং ৩৫)

সারণি ১১.৫.৩ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০১৩-১৪ এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছর ব্যতীত প্রবাসে কর্মরত জনশক্তি কর্তৃক প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের সিংহভাগ আসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ থেকে। একক দেশ হিসেবে সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের পরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সৌদি আরবে কর্মরত প্রবাসীরা ২৯৫৫.৬০ মিলিয়ন ডলার, সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ২৭১১.৭০ মিলিয়ন ডলার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২৪২৪.৩০ মিলিয়ন ডলার, মালয়েশিয়া থেকে ১৩৩৭.১০ মিলিয়ন ডলার, কুয়েত থেকে ১০৪০.০০ মিলিয়ন ডলার অর্থ দেশে প্রেরণ করে। অবশিষ্ট অর্থ অন্যান্য দেশে কর্মরত প্রবাসীরা প্রেরণ করে।

বাংলাদেশী জনশক্তি চাহিদার কারণ : বিদেশে বাংলাদেশী জনশক্তির প্রচুর চাহিদা রয়েছে। নিম্নে জনশক্তি চাহিদার উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ বর্ণনা করা হলো:

১. স্বল্পমূল্যে জনশক্তি প্রাপ্তির সুবিধা : অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের জনশক্তি অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যে আমদানিকারক দেশসমূহ পেয়ে থাকে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এদেশের জনশক্তির প্রতি আমদানিকারক দেশসমূহের বিশেষ আগ্রহ থাকে।

২. জনশক্তির সহজলভ্যতা : জনবহুল বাংলাদেশে বহুসংখ্যক কর্মক্ষম জনশক্তি রয়েছে। ফলে জনশক্তি আমদানিকারক দেশসমূহ খুব সহজেই যে কোনো সময় যে কোনো প্রয়োজনে এদেশের জনশক্তি পেয়ে থাকে।

৩. জনশক্তির কর্মক্ষমতা ও সততা : এদেশের কর্মক্ষম জনশক্তি নিজেদের দেশের পাশাপাশি আমদানিকারক দেশেও কঠোর পরিশ্রম করতে দ্বিধাবোধ করে না। যে কোনো প্রতিকূল পরিবেশেও কর্মরত দেশের উন্নয়নে কঠোর পরিশ্রম করে যা এদেশ থেকে জনশক্তি আমদানির অন্যতম ইতিবাচক দিক। এছাড়া বিদেশে কর্মরত জনশক্তি অত্যন্ত সততার সাথে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে থাকে। নিয়োগ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন হ্রাস-বৃদ্ধি, বেতন, বোনাস, চিকিৎসাসহ অন্যান্য বিষয়ে নানা অসন্তোষ উদ্ভব হলেও বাংলাদেশী জনশক্তি সততা, দক্ষতা ও সহিষ্ণুতার সাথে তা মোকাবেলা করে।

৪. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন : জনশক্তি আমদানিকারক দেশসমূহ বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি আমদানি করে সেদেশের উৎপাদন বৃদ্ধি, অবকাঠামো নির্মাণসহ বিভিন্ন পেশায় ঘাটতি জনশক্তি পূরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে গতিশীল হওয়ার কারণে সেসব দেশ অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যায়।

৫. শিল্পের প্রসার : জনশক্তি আমদানিকারক দেশসমূহে শিল্পের প্রসারের জন্য প্রচুর পরিমাণে জনশক্তি প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশের সস্তা ও সহজলভ্য জনশক্তি বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে জনশক্তি আমদানিকারক দেশের শিল্পের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৬. বাংলাদেশের সাথে সুসম্পর্ক : বাংলাদেশ বিশ্বের সকল দেশের সাথে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্কে বিশ্বাসী। এই নীতির আলোকে বিদেশে কর্মরত জনশক্তি সংশ্লিষ্ট দেশের সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক দৃঢ় করতে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। যা এদেশ থেকে জনশক্তি আমদানিতে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহকে উৎসাহিত করে।

উপরিউক্ত কারণগুলো ছাড়াও শ্রমিকদের শান্ত স্বভাব, পণ্যদ্রব্যের মান উন্নয়নে যথার্থ মনোযোগ, জাতীয় আয় বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে এদেশের জনশক্তি আমদানিকারক দেশসমূহের কাছে চাহিদার অন্যতম কারণ।

জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধিতে সরকারে গৃহীত পদক্ষেপ : জনশক্তি রপ্তানির গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে সরকার বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধিতে সরকারের গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. শ্রমবাজার সম্প্রসারণ : বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি রপ্তানির প্রধান বাজার মধ্যপ্রাচ্য। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শ্রমবাজার সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন পর্যায় থেকে সম্ভাব্য দেশসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ চলমান রয়েছে। জনশক্তি রপ্তানি সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন দেশের সাথে জিটুজি (Government to Government) চুক্তি স্বাক্ষর করছে। নতুন নতুন শ্রমবাজার খুজে বের করার জন্য প্রবাসী কল্যাণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে শ্রমবাজার গবেষণা সেল গঠন করা হয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে হংকং, জাপান, জর্ডান, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, রাশিয়া, কানাডা, সুইডেন, দক্ষিণ আফ্রিকা, জার্মানিসহ ৬৩টি দেশে নতুন শ্রমবাজার সম্প্রসারিত হয়েছে।

২. বহির্গমন প্রক্রিয়া আধুনিকায়ন : বিদেশগামী জনশক্তির হয়রানি বন্ধে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ফিংগার প্রিন্টসহ যাবতীয় তথ্য ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এই ডাটাবেজের তথ্য ব্যবহার করে স্মার্ট কার্ডের সাহায্যে বর্হিগর্মন প্রক্রিয়া আধুনিকায়ন হয়েছে।

৩. জিটুজি পর্যায়ে শ্রমশক্তি প্রেরণ : জিটুজি পর্যায়ে জনশক্তি রপ্তানি চুক্তির মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্বল্প খরচে বা বিনা খরচে (যেমন-জর্ডানে) গমন করা যায়। এতে আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল কর্মক্ষম লোকেরা সহজেই বিদেশে গমন করতে পারে।

৪. প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন : ওয়েজ আর্নারস কল্যাণ তহবিলের অর্থায়নে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক নামে একটি বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশগামী জনশক্তিকে ঋণ প্রদান বা বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর যাতে পুনঃ কর্মসংস্থান হয় সেজন্য ঋণ প্রদান করে থাকে।

৫. অনলাইন সুবিধা : দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ যে কোনো প্রান্তে বসবাসকারী আগ্রহী বিদেশগামীরা যাতে সহজেই নাম নিবন্ধন করতে পারে সেজন্য অনলাইন সুবিধা চালু করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত তথ্য সেবা কেন্দ্র থেকে সহযোগিতা করা হয়।

৬. জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর কল্যাণ শাখা : জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর অধীনে একটি বিশেষ সেবাধর্মী শাখা হলো কল্যাণ শাখা। বিদেশগামী জনশক্তিকে তথ্য প্রদান, প্রশিক্ষণ প্রদান, বিমানবন্দরে নিরাপদে গমন ও প্রত্যাবর্তন, বিদেশে আটকে পড়া জনশক্তি ফেরৎ আনা, বিদেশে কর্মরত কর্মীর মৃতদেহ দেশে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা ও দাফন বাবদ আর্থিক সাহায্য করা, ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেওয়া, অসুস্থতাসহ যে কোনো প্রয়োজনে কল্যাণ শাখা কাজ করে থাকে।

৭. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম : দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির লক্ষ্যে বিদেশগামীদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এসব প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে রয়েছে ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার প্রভৃতি। এছাড়া বেসরকারি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা হচ্ছে।

উপরিউক্ত পদক্ষেপসমূহ ছাড়াও জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধিতে অভিবাসী ব্যয় নিয়ন্ত্রণে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন-২০১৩ প্রণয়ন, বৈধ চ্যানেলে রেমিটেন্স প্রেরণ উৎসাহিতকরণসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকার যেসব মানুষ কর্মের জন্য বিদেশে গমন করে তার কারণ বিশ্লেষণ করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম উপায় জনশক্তি রপ্তানি। জনবহুল এদেশের বিপুল সম্ভাবনাময় খাত জনশক্তি। পেশাজীবী, দক্ষ, আধা-দক্ষ, স্বল্প দক্ষ জনশক্তি বিদেশে রপ্তানি করা হয়। পূর্বে দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা কম থাকলেও ক্রমশ তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই সাথে স্বল্প দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যাও বাড়ছে। তাই আধা-দক্ষ এবং স্বল্প দক্ষ শ্রমিকদের পুরোপুরি দক্ষ করে বিদেশে রপ্তানি করতে পারলে আরো অধিক পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রবাসী জনশক্তির সংখ্যা ছিল ৬.৮৫ লক্ষ এবং প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ছিল ১৪,৯৩১ মিলিয়ন ডলার যা জিডিপির শতকরা ৬.৭৬ ভাগ। বহির্বিশ্বে এদেশের জনশক্তির ব্যাপক চাহিদার অন্যতম কারণ হলো

সস্তা ও সহজলভ্য জনশক্তি, অধিক পরিশ্রমী, সততা, দেশপ্রেম, আমদানিকারক দেশের শিল্প ও অবকাঠামো গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান প্রভৃতি। জনশক্তি রপ্তানির গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার বিদেশে কর্মরত জনশক্তির চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রেখেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রবাসী জনশক্তি কর্তৃক প্রেরিত অর্থের পরিমাণ জিডিপির শতকরা কত ভাগ ছিল?

(ক) ৪.৭৬% (খ) ৫.৭৬% (গ) ৬.৭৬% (ঘ) ৭.৭৬%

২। বাংলাদেশ বিদেশে রপ্তানি করে-

i. দক্ষ জনশক্তি ii. আধা-দক্ষ জনশক্তি iii. স্বল্প দক্ষ জনশক্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। ফলে সকল মানুষের সময়মতো কর্মসংস্থান করা কঠিন হয়ে পড়ে। একারণে বহু মানুষ কর্মের সন্ধানের পাশাপাশি বিভিন্ন কারণে দেশের বাইরে গমন করে। অনেকে আবার বিদেশে উচ্চশিক্ষা লাভ করে সেখানেই কর্মে সম্পৃক্ত হয়। বিদেশে কর্মরত এসব জনশক্তি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার পাশাপাশি কর্মরত দেশের উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৩। বাংলাদেশ কত সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনশক্তি রপ্তানি শুরু করে?

(ক) ১৯৭৬ সাল (খ) ১৯৭৭ সাল (গ) ১৯৭৮ সাল (ঘ) ১৯৭৯ সাল

৪। জনশক্তি রপ্তানি ভূমিকা রাখে-

i. বেকারত্ব হ্রাসে ii. কর্মসংস্থানে iii দারিদ্র বিমোচনে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১১.৬ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পোতাশ্রয় ও পশ্চাদভূমির ভূমিকা
(Role of Harbour and Hinterland in Foreign Trade of Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পোতাশ্রয় ও পশ্চাদভূমি বলতে কী বুঝায় তা জানতে পারবেন এবং
- বৈদেশিক বাণিজ্যে পোতাশ্রয় ও পশ্চাদভূমির ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

পোতাশ্রয় ও পশ্চাদভূমি

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পোতাশ্রয় এবং পশ্চাদভূমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকাংশই সাধারণত সমুদ্রবন্দর দিয়ে সম্পন্ন করা হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই পোতাশ্রয় ও পশ্চাদভূমি প্রয়োজন হয়। চট্টগ্রাম এবং মংলা সমুদ্রবন্দরকে কেন্দ্র করেই পোতাশ্রয় ও পশ্চাদভূমি গড়ে উঠেছে।

পোতাশ্রয় (Harbour) : পোতাশ্রয় শব্দটি পোত এবং আশ্রয় নামক দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। পোত শব্দের অর্থ জাহাজ এবং আশ্রয় অর্থ জাহাজের অবলম্বন স্থান। সুতরাং বলা যায় যে, সমুদ্র উপকূলের যে স্থানে জাহাজ নিরাপদে অবস্থান করতে পারে সেই স্থানই পোতাশ্রয়। এটি এমন স্থানে করা হয় যেখানে ঝড়-ঝঞ্জা বা সমুদ্র তরঙ্গ প্রবেশ করতে পারেনা। পোতাশ্রয় সাধারণত সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত হয় বলে পণ্য খালাস বা বোঝাই এবং যাত্রী উঠানামা সহজ হয়। কোনো সমুদ্রবন্দর বাণিজ্যিকভাবে গড়ে উঠার জন্য একটি আদর্শ পোতাশ্রয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। পোতাশ্রয় দুই প্রকারের হয়ে থাকে। যথা-স্বাভাবিক পোতাশ্রয় এবং কৃত্রিম পোতাশ্রয়।

১. স্বাভাবিক পোতাশ্রয় (Natural Harbour) : সমুদ্রবন্দরের সন্নিকটে প্রকৃতিগতভাবেই ভগ্ন, জলভাগের অধিক গভীরতা, চতুর্দিকে স্থলভাগ বেষ্টিত এমন স্থান যেখানে জাহাজসমূহ সহজেই নিরাপদে আশ্রয় নিতে পারে তাকে স্বাভাবিক পোতাশ্রয় বলে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের পোতাশ্রয় প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে গড়ে উঠেছে। এ ধরনের পোতাশ্রয় সাধারণত উপসাগরীয় ভগ্ন উপকূলে বা নদ-নদীর মোহনায় গড়ে উঠে।

২. কৃত্রিম পোতাশ্রয় (Artificial Harbour) : প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ যেসব পোতাশ্রয় গড়ে তোলে সেগুলোকে কৃত্রিম পোতাশ্রয় বলে। সমুদ্রের মধ্যে পাথর, মাটি ও কংক্রিটের দ্বারা বাঁধ দিয়ে সমুদ্রের ঢেউ ভেঙ্গে এবং বন্দরের সন্নিকটে পানির গভীরতা বজায় রাখার জন্য ড্রেজিং করতে হয়। কৃত্রিম পোতাশ্রয় ব্যয়বহুল এবং আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট হয় বলে একসঙ্গে অধিক জাহাজ আশ্রয় নিতে পারে না। যেমন- শ্রীলংকার কলম্বো এবং ভারতের মাদ্রাজ বন্দরের পোতাশ্রয়।

একটি আদর্শ পোতাশ্রয় গড়ে উঠার নিয়ামক : একটি আদর্শ পোতাশ্রয় গড়ে উঠার জন্য ভগ্ন ও গভীর উপকূল, প্রশস্ত খাড়ি, বরফ, কুয়াশা ও দুর্যোগ মুক্ত অবস্থা, সমভূমির অবস্থান, সুপেয় পানি ও পর্যাপ্ত জ্বালানি থাকা আবশ্যক। এছাড়া অর্থনৈতিক নিয়ামকসমূহের মধ্যে রয়েছে মূলধন, উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ, সুলভ ও দক্ষ শ্রমিক, সরকারি প্রচেষ্টা প্রভৃতি।

পশ্চাদভূমি (Hinterland) : কোনো একটি অঞ্চলের পণ্যদ্রব্য যখন কোনো সমুদ্রবন্দরের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানি করা হয় এবং ঐ বন্দরের মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্যদ্রব্য উক্ত অঞ্চলে পাঠানো হয়, সে অঞ্চলকে উক্ত বন্দরের পশ্চাদভূমি বলে। যেমন-বাংলাদেশকে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের পশ্চাদভূমি বলা হয়। কারণ বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যসমূহ চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দর ব্যবহার করে বিদেশে রপ্তানি করা হয় এবং বিদেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্যদ্রব্য এ দুইটি বন্দরের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে সরবরাহ করা হয়। আবার কলকাতা সমুদ্রবন্দরের পশ্চাদভূমি হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার ও উত্তর প্রদেশকে বিবেচনা করা হয়।

বৈদেশিক বাণিজ্যে পোতাশ্রয় ও পশ্চাদভূমির ভূমিকা : বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে পোতাশ্রয় এবং পশ্চাদভূমির ভূমিকা অপরিসীম। চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের পোতাশ্রয় প্রাকৃতিক নিয়মে গড়ে উঠায় এর পরিধি বিস্তৃত এবং সাশ্রয়ী। অর্থাৎ এই দুইটি পোতাশ্রয়ে একই সঙ্গে অনেক জাহাজ নোঙ্গর করে নিরাপদে আশ্রয় নিতে পারে এবং সহজেই পণ্যদ্রব্য ও যাত্রী উঠানামা করা যায়। প্রাকৃতিক পোতাশ্রয় হওয়ার কারণে রক্ষণাবেক্ষণ খরচ সাশ্রয় হয়। এছাড়া বন্দরের নিকট পানির

গভীরতা বজায় রাখার জন্য ড্রেজিং করার প্রয়োজন হয় না। এর ফলে কৃত্রিম পোতাশ্রয়ের তুলনায় চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের পোতাশ্রয় অধিক সুবিধাজনক যা সার্বিকভাবে বৈদেশিক আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সম্পাদন সহজ করেছে।
অন্যদিকে, সমগ্র বাংলাদেশ চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের পশ্চাদভূমি হওয়ায় অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত কৃষিজাত পণ্য, কৃষিভিত্তিক শিল্পজাত পণ্য, তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার এবং অন্যান্য পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়। একই সাথে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, ইলেকট্রনিক্স পণ্য, খাদ্যসামগ্রী, গাড়ি প্রভৃতি দেশের অভ্যন্তরে সরবরাহ করা হয়। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের অধিকাংশই চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের মাধ্যমে সম্পাদন হওয়ায় পশ্চাদভূমি হিসেবে বাংলাদেশের গুরুত্ব অপরিসীম। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক গতিশীলতার ক্ষেত্রে আদর্শ এবং উপযুক্ত পশ্চাদভূমির বিকল্প নেই।

বৈদেশিক বাণিজ্যে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর : বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে এই বন্দর দুটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা করা হলো (সারণি ১১.৬.১)।

চট্টগ্রাম বন্দর : চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তীরে বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্রবন্দরটি অবস্থিত। এ বন্দরের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রায় ৯২ শতাংশ পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি করা হয়। চট্টগ্রাম বন্দরকে বাংলাদেশের প্রবেশ দ্বার বলা হয়। এছাড়া চট্টগ্রামকে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে গণ্য করা হয়। এ বন্দরের সাথে দেশের বিভিন্ন স্থানের সড়কপথ, রেলপথ, বিমানপথ এবং নৌপথ রয়েছে। ফলে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে রপ্তানি পণ্য এবং বিদেশ থেকে আমদানি পণ্য সহজেই আনা-নেওয়া করা যায়। এছাড়া চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরকে কেন্দ্র এর পাশ্ববর্তী এলাকাসমূহে অসংখ্য শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে। সমুদ্রপথকে ব্যবহার করে ভারী ও বৃহদাকার যন্ত্রপাতিসহ যে কোনো পণ্যদ্রব্য সহজেই এবং সুলভে পরিবহন করা যায়। বৈদেশিক বাণিজ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করছে। এসব পদক্ষেপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বন্দরের আধুনিকায়ন, কন্টেইনার ও কন্টেইনারজাত পণ্য হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি বৃদ্ধি, জাহাজের গড় অবস্থানকাল কমিয়ে আনা প্রভৃতি। এছাড়া বন্দরে পণ্যদ্রব্য উঠানামার স্থানে ছাউনি, গুদামঘর, শস্যভবন, তেলবাহী জাহাজ বা ট্যাঙ্কারের জন্য আলাদা নোঙ্গর ঘাট, উন্নত মানের জেটি, পর্যাপ্ত খোলামেলা পরিবেশ এ বন্দরকে সমৃদ্ধ করেছে।

মংলা বন্দর : বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর মংলা। ১৯৫০ সালে চালনার নিকট পশুর নদীর তীরে চালনা বন্দর নামে চালু হয়। কিন্তু নদীর গভীরতা কম থাকায় জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ায় ১৯৫৪ সালের ২০ জুন তারিখে চালনা বন্দরকে খুলনা শহর থেকে ৫০ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং চালনা থেকে ১৬ কিলোমিটার দক্ষিণে বাগেরহাট জেলায় পশুর ও মংলা নদীর মিলনস্থল মংলা নামক স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়। এ কারণে পরবর্তীতে এ বন্দরের নাম রাখা হয় মংলা বন্দর। এ বন্দরটি নৌপথের মাধ্যমে বরিশাল, পটুয়াখালী এবং ফরিদপুরের সাথে সংযুক্ত। এছাড়া এ বন্দরের সাথে সড়কপথ এবং খুলনা থেকে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে রেলপথের সংযোগ রয়েছে। এ বন্দরে বেশ কয়েকটি জেটি, পণ্যদ্রব্য উঠানামার ছাউনি, ক্রেন, গুদামঘর কন্টেইনার ইয়ার্ড, কার পার্কিং, মুরিং বয়া প্রভৃতি রয়েছে। মংলা বন্দরের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসব উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে ঢাকা-মাওয়া-মংলা সড়কের মাওয়ায় পদ্মা নদীর উপর পদ্মা সেতু নির্মাণ, মংলা পর্যন্ত রেললাইন স্থাপন, গ্যাস সরবরাহ, বিমানবন্দর নির্মাণ প্রভৃতি। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের এ সমুদ্র বন্দরের আধুনিকায়নের কাজ সম্পন্ন হলে অর্থনৈতিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং সামগ্রিকভাবে চট্টগ্রাম বন্দরের উপর চাপ অনেক কমে যাবে।

সারণি ১১.৬.১ : চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দরের মাধ্যমে পণ্য আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ (লক্ষ টন)

অর্থ বছর	চট্টগ্রাম বন্দর			মংলা বন্দর		
	আমদানি	রপ্তানি	মোট	আমদানি	রপ্তানি	মোট
২০০৭-০৮	২৫৩.৪৬	৩৬.০১	২৮৯.৪৭	৫.১৮	২.০৫	৭.২৩
২০০৮-০৯	২৩৪.৪৯	২৪.০৫	২৫৮.৪৭	৯.৩২	২.০৯	১২.৪১
২০০৯-১০	৩২৮.১৪	৪১.৮৭	৩৭০.০১	১৫.০১	১.৪৮	১৬.৪৯
২০১০-১১	৩৯৯.১৪	৪৯.৮১	৪৪৮.৯৫	২৫.৩০	১.৬৭	২৬.৯৭
২০১১-১২	৩৬১.৮৫	৪৭.১৭	৪০৯.০২	২৪.৮৩	১.৩৬	২৬.১৯

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বই-২০১৫, বিবিএস

পায়রা বন্দর : বাংলাদেশে তৃতীয় সমুদ্রবন্দর হিসেবে পায়রা বন্দরের যাত্রা শুরু ২০১৩ সালের ১৯ নভেম্বর। এ বন্দরটি পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার টিয়াখালী ইউনিয়নের আন্ধারমানিক নদীর তীরে অবস্থিত। এ বন্দরকে অপারেশনাল কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার জন্য ইতোমধ্যে বহির্নোঙ্গরে ক্রিংকার ও অন্যান্য বাল্ক পণ্যবাহী জাহাজ আনয়ণ এবং বার্জের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে পণ্য পরিবহনের জন্য ফেয়ারওয়ে ও মুরিং বয়া স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া যোগাযোগের জন্য বেইজ স্টেশনসহ যন্ত্রপাতি স্থাপন, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এ বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, দেশের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য সাধারণত চট্টগ্রাম এবং মংলা বন্দর দিয়ে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এছাড়া ২০১৩ সালে চালু হয়েছে পায়রা সমুদ্রবন্দর। এ সকল সমুদ্রবন্দর বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য সহজ এবং সাশ্রয়ী করার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিকে গতিশীল করছে। শিক্ষার্থীবৃন্দ, উপরিউক্ত আলোচনায় আমরা বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের পোতাশ্রয় এবং পশ্চাদভূমির ভূমিকা সম্পর্কে জানলাম।

শিক্ষার্থীর কাজ	স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম পোতাশ্রয়ের দুইটি করে বৈশিষ্ট্য লিখুন।

স্বাভাবিক পোতাশ্রয়	কৃত্রিম পোতাশ্রয়ের

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য সাধারণত চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দর দিয়ে সম্পন্ন করা হয়। এই দুইটি বন্দরের পোতাশ্রয় এবং পশ্চাদভূমির সুবিধা বৈদেশিক আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সহজ এবং সাশ্রয়ী করে তুলেছে। এর মধ্যে একমাত্র চট্টগ্রাম বন্দর দিয়েই প্রায় ৯২% পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি করা হয়। ২০১১-১২ অর্থবছরে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে ৩৬১.৮৫ লক্ষ টন পণ্য আমদানি এবং ৪৭.১৭ লক্ষ টন পণ্য রপ্তানি করা হয়। একই অর্থবছরে মংলা বন্দর দিয়ে ২৪.৮৩ লক্ষ টন পণ্য আমদানি এবং ১.৩৬ লক্ষ টন পণ্য রপ্তানি করা হয়। এছাড়া ২০১৩ সালে তৃতীয় সমুদ্রবন্দর হিসেবে পায়রা বন্দর যাত্রা শুরু করে। এসব বন্দরের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনা করে বলা যায় যে, বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে পোতাশ্রয় এবং পশ্চাদভূমির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পোত শব্দের অর্থ কী?
(ক) স্টীমার (খ) লঞ্চ (গ) জাহাজ (ঘ) ফেরি

২। পোতাশ্রয় কত প্রকারের?
(ক) দুই (খ) তিন (গ) চার (ঘ) পাঁচ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩, ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানিতে সহজ ও সুলভ পরিবহন ব্যবস্থা আবশ্যক। যে কোনো পরিবহন মাধ্যমের তুলনায় জলপথ সাশ্রয়ী। এজন্য বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকাংশই দক্ষিণে অবস্থিত সমুদ্রবন্দরসমূহের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। সমুদ্রবন্দরের জন্য প্রয়োজন পোতাশ্রয় ও পশ্চাদভূমি। যা দেশের বাণিজ্য প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৩। চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
(ক) কর্ণফুলি (খ) পশুর (গ) মংলা (ঘ) মেঘনা

৪। স্বাভাবিক পোতাশ্রয় গড়ে উঠেছে-
i. কলম্বো সমুদ্রবন্দরে ii. চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে iii. মংলা সমুদ্রবন্দরে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫। চট্টগ্রাম বন্দরের পশ্চাদভূমি কোনটি?
(ক) খুলনা (খ) বাগেরহাট (গ) চট্টগ্রাম (ঘ) সমগ্র বাংলাদেশ

পাঠ-১১.৭ বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রধান বাণিজ্যিক দেশসমূহ (Trade Relationship of Major Countries with Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রধান বাণিজ্যিক দেশসমূহের বাণিজ্যের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রধান বাণিজ্যিক দেশসমূহ

উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ উদীয়মান অর্থনীতির দেশ। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়েছে এদেশ। ফলে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সম্পর্কের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে বাণিজ্যিক সম্পর্ক। বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্কযুক্ত দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো চীন, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, মালয়েশিয়া প্রভৃতি। বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের বেশিরভাগই এসব দেশের সাথে সম্পাদিত হয়। বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্কযুক্ত প্রধান দেশসমূহের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য নিম্নরূপ:

চীন : বাংলাদেশের অন্যতম বন্ধু প্রতীম দেশ ও উন্নয়ন সহযোগী চীন। বাংলাদেশের সাথে চীনের রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক দৃঢ় হওয়ার কারণে সামরিক সাহায্য ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ, প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি প্রাপ্তি সহজ হয়েছে। দুই দেশের বিরাজমান চমৎকার সম্পর্কের কারণে ২০০৫ সালকে 'চীন বাংলাদেশ মৈত্রী' বছর হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ চীন থেকে ২,৫৭১ মিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করে যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১২,৫৮২ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। মাত্র ১০ বছরে পণ্য আমদানির পরিমাণ প্রায় ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। চীনের সাথে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ রপ্তানির তুলনায় অনেক বেশি আমদানি করে ফলে বাণিজ্য ঘাটতি দেখা দেয়। চীনের তৈরি জিনিসপত্র তুলনামূলক সস্তা হওয়ায় বাংলাদেশ চীন থেকে অধিক পরিমাণে আমদানি করে থাকে।

আমদানি পণ্য : কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, তুলা ও সুতা, পরিবহন সামগ্রী, ঔষধ, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, ইলেকট্রনিক্স ও বৈদ্যুতিক দ্রব্যাদি, খেলনা, ব্যাগ প্রভৃতি।

রপ্তানি পণ্য : পাট ও পাটজাত দ্রব্য, ব্যাঙের পা, হস্তশিল্পজাত পণ্য, সামান্য পরিমাণে রাসায়নিক সার প্রভৃতি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্কযুক্ত দেশসমূহের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্যতম। বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য অংশীদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এদেশের তৈরি পোশাকের বৃহত্তম বাজার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানি করে আয় ছিল ৩,৪৪১.০২ মিলিয়ন ডলার এবং পণ্য আমদানি করা হয়েছে ৩৮০ মিলিয়ন ডলারের। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে রপ্তানি আয় দাঁড়ায় ৬,২২০.৬৫ মিলিয়ন ডলার এবং আমদানি ব্যয় ১,১৩৪ মিলিয়ন ডলার। অন্যান্য দেশের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমদানির তুলনায় রপ্তানির পরিমাণ অনেক বেশি যা বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

আমদানি পণ্য : সুতা, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, যন্ত্রপাতি, গম, ঔষধ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপাদান।

রপ্তানি পণ্য : তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার, চিংড়ি, চা, টুপি, গলফ উপকরণ, প্লাস্টিক ব্যাগ, নিদ্রা ব্যাগ, রান্নার সরঞ্জামাদি, সুতি কার্পেট, রাবার, প্লাস্টিক প্রভৃতি।

জাপান : বাংলাদেশ এবং জাপান বাণিজ্যিক সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী জাপান। এদেশের সাথে বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক চুক্তি রয়েছে যার আওতায় পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ সহায়তা চুক্তি। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে জাপান থেকে ৬৯০ মিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করা হয় যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২,০৭৫ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, ২০০৬-০৭ অর্থবছরে পণ্য রপ্তানি আয় ছিল ১৪৭.৪৭ মিলিয়ন ডলার যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১,০৭৯.৫৫ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

আমদানি পণ্য : শিল্পের যন্ত্রপাতি, ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী, রাসায়নিক দ্রব্য, পরিবহন সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি, শিল্পজাত দ্রব্য, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি।

রপ্তানি পণ্য : তৈরি পোশাক, চামড়াজাত পণ্য, চিংড়ি, পাট ও পাটজাত পণ্য, চা, হিমায়িত দ্রব্য প্রভৃতি।

ভারত : নিকটতম প্রতিবেশি দেশ হিসেবে ভারতের সাথে বাংলাদেশের নিবিড় বাণিজ্য সম্পর্ক রয়েছে। ভারত থেকে পণ্য আমদানি-রপ্তানির পরিবহন ব্যবস্থাও তুলনামূলক সহজ। বাংলাদেশের সাথে ভারতের সড়ক, রেল, নৌ এবং বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। তবে ভারতের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ভারত থেকে ২,২৬৮ মিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করা হয় যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৫,৭২২ মিলিয়ন ডলার। আর ২০০৬-০৭ অর্থবছরে পণ্য রপ্তানি আয় ছিল প্রায় ২৮৯ মিলিয়ন ডলার যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৬৯০ মিলিয়ন ডলার।

আমদানি পণ্য : পরিবহন সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি, তুলা ও সুতা, জ্বালানি তেল, খাদ্যসামগ্রী, পোশাক, রাসায়নিক দ্রবাদি, পাথর, খেলনা প্রভৃতি।

রপ্তানি পণ্য : পাট ও পাটজাত পণ্য, তৈরি পোশাক, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, হিমায়িত খাদ্যসামগ্রী ইতাদি।

যুক্তরাজ্য : বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের বৃহৎ অংশীদার যুক্তরাজ্য। অন্যান্য অনেক দেশের ন্যায় যুক্তরাজ্যের সাথেও বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির তুলনায় আমদানির পরিমাণ অধিক। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ১,১৭৩.৯৫ মিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করা হয় যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩,৮০৯.৭০ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।

আমদানি পণ্য : সুতা, জাহাজ, লৌহ ও ইস্পাত, মেশিনারিজ ও মেকানিক্যাল যন্ত্রপাতি, সার, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, বইপত্র, পরিবহন যন্ত্র, শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রভৃতি।

রপ্তানি পণ্য : তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার, হিমায়িত খাদ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, চামড়াজাত পণ্য, চা, হস্তশিল্পজাত পণ্য প্রভৃতি।

দক্ষিণ কোরিয়া : দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের তুলনায় আমদানির পরিমাণ বেশি। উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক বিনিয়োগ, দক্ষতা ও প্রযুক্তি বিনিয়োগ, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ১৯৭৩ সালে উভয় দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি বাণিজ্যিক চুক্তির মাধ্যমে বিনিয়োগ শুরু হয়। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে ৫৫৩ মিলিয়ন ডলারের সমমূল্যের পণ্য আমদানি করা হয় যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১,৪১৭ মিলিয়ন ডলার পৌঁছেছে।

আমদানি পণ্য : লৌহ ও ইস্পাত, কপার, এ্যালুমিনিয়াম, লেড, জিংক, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, পেপার, পেপার বোর্ড, জ্বালানি, ফার্নেস ওয়েল, প্লাস্টিক সামগ্রী, যন্ত্র, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি।

রপ্তানি পণ্য : তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, ন্যাপথালিন, বিটুমিনাস, হিমায়িত খাদ্য, ঔষধ ও ঔষধি পণ্য, জুতা, টুপি, ছাতা প্রভৃতি।

জার্মানি : বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত পণ্যের বিশাল বাজার জার্মানি। পণ্য রপ্তানি করে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয় হয় জার্মানি থেকে। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ১,৯৫৫.৩৮ মিলিয়ন ডলার, যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৪,৯৮৮.০৭ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। মাত্র কয়েক বছরে বিপুল পরিমাণ পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। এদেশে প্রধান রপ্তানি পণ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার, হিমায়িত চিংড়ি, টুপি, হোম টেক্সটাইল প্রভৃতি।

উপরিউক্ত দেশসমূহ ছাড়াও ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, কানাডা প্রভৃতি দেশে অধিক পরিমাণে পণ্য রপ্তানি করা হয় এবং সিঙ্গাপুর, হংকং, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে পণ্য আমদানির পরিমাণ বেশি। বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রধান বাণিজ্যিক দেশসমূহের সাথে বাণিজ্য ঘাটতি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। তবে এসব দেশের সাথে আমদানি রপ্তানির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ফলে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব দেশের সাথে নতুন নতুন পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিম্নে উল্লিখিত দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি পণ্যসমূহের লিখুন।

দেশ	রপ্তানি পণ্য	আমদানি পণ্য
চীন		
ভারত		
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র		
জাপান		
দক্ষিণ কোরিয়া		
জার্মানি		

সারসংক্ষেপ

পণ্য আমদানি-রপ্তানি একটি চলমান প্রক্রিয়া। প্রয়োজনের তাগিদে উৎপাদিত পণ্যের উদ্বৃত্ত অংশ বিদেশে রপ্তানি করা হয় আবার ঘাটতি পণ্যসমূহ বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য থাকলেও কতিপয় দেশের সাথে ঘনিষ্ট বাণিজ্য রয়েছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্য সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, কানাডা, জাপান প্রভৃতি দেশে। কিন্তু পণ্য বেশি আমদানি করা হয় চীন, ভারত, সিঙ্গাপুর, জাপান, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে। এসকল দেশসমূহের মধ্যে চীন, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি দেশের সাথে নিবিড় বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশ যেসব দেশে পণ্য আমদানি-রপ্তানি করে থাকে সেসব দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ক্রমশ সুদৃঢ় ও প্রসারিত হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশ কোন দেশ থেকে সবচেয়ে বেশি পণ্য আমদানি করে?

(ক) চীন (খ) তাইওয়ান (গ) ইরাক (ঘ) দক্ষিণ আফ্রিকা

২। বাংলাদেশ কোন দেশে সবচেয়ে বেশি পণ্য রপ্তানি করে?

(ক) শ্রীলঙ্কা (খ) থাইল্যান্ড (গ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (ঘ) কোনটিই নয়

৩। চীন থেকে আমদানি করা হয়-

i. কলকব্জা ii. পরিবহন সামগ্রী iii. ব্যাঙের পা

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের বৃহৎ বাজার কোনটি?

(ক) ভারত (খ) চীন (গ) আফগানিস্তান (ঘ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

৫। দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আমদানি করা হয় -

i. লৌহ ও ইস্পাত ii. এ্যালুমিনিয়াম iii. ফার্নেস ওয়েল

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১১.৮ বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব (Importance to Increase Export Goods of Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব

বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে রপ্তানি আয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। রপ্তানি আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটানো যায়। বাংলাদেশের বাণিজ্য ক্রমশ বৃদ্ধি পেলেও আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। বাণিজ্য ঘাটতিতে ভারসাম্য আনয়নের লক্ষ্যে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন ও সংখ্যা বৃদ্ধি আবশ্যক। বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত পণ্যসমূহের মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার থেকে রপ্তানি আয় ছিল মোট রপ্তানি আয়ের ৮২.০১%। অবশিষ্ট পণ্যসমূহের রপ্তানি আয় মাত্র ১৭.৯৯%। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের ভারসাম্যহীনতা এবং তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার শিল্পের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন এবং সংখ্যা বৃদ্ধির অপরিহার্যতা তুলে ধরছে। নিম্নে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব বর্ণনা করা হলো:

১. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন : বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম উপায় পণ্য রপ্তানি। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানি পণ্যের তালিকায় প্রচলিত পণ্যের পাশাপাশি অপ্রচলিত পণ্যের উৎপাদন ও সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

২. বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস : বাংলাদেশের সাথে বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি রয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশ যেসব দেশে পণ্য রপ্তানি করে, সেসব দেশ থেকে তার চেয়ে অনেক বেশি আমদানি করে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ পণ্য রপ্তানি করে প্রায় ৩৪,২৫৭ মিলিয়ন ডলারের। কিন্তু পণ্য আমদানি করে প্রায় ৪২,৯২১ মিলিয়ন ডলারের। অর্থাৎ আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য ভারসাম্যহীনতা বিরাজমান। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য রপ্তানি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই।

৩. জাতীয় আয় বৃদ্ধি : রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেলে সামগ্রিকভাবে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে। এতে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। বিভিন্ন পণ্যের উপর রপ্তানি শুল্ক আরোপের মাধ্যমে রাজস্ব আয় বাড়বে যা দ্রুত উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

৪. রপ্তানি পণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি : রপ্তানিকৃত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি সংখ্যাও বাড়াতে হবে। বিশ্ববাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রচলিত পণ্যের পাশাপাশি অপ্রচলিত পণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। এতে করে পণ্যের উৎপাদন চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং উৎপাদনকারী সঠিক মূল্য পাবে।

৫. কর্মসংস্থান সৃষ্টি : বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত এবং বেকার কর্মক্ষম মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ও অকৃষি উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। রপ্তানিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে এসব পণ্য শিল্প-কারখানায় প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

৬. কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি : রপ্তানি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। এতে কৃষকের আয় বৃদ্ধি পাবে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। কৃষি উন্নয়ন ত্বরান্বিত হলে কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন শিল্প-কারখানা গতিশীল হবে।

৭. নতুন শিল্পের বিকাশ : নতুন শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হলে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। নতুন নতুন শিল্পের জন্য উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা থাকলে এবং পর্যাপ্ত মূল্য পেলে উদ্যোগক্তারা অধিক উৎসাহী হবে। একইসাথে নতুন শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের অভ্যন্তরীণ ভোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ করতে হবে।

৮. পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা : যেসব দেশে পণ্য রপ্তানি করা হয় সেসব দেশে সময়মতো পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সময় ও চাহিদা অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হলে পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। এতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পণ্য রপ্তানিতে আস্থা তৈরি হবে যা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়ক হবে।

৯. আমদানি-রপ্তানি ব্যয়ে ভারসাম্য : বাংলাদেশের রপ্তানির তুলনায় আমদানির পরিমাণ অধিক হওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার একটি বড় অংশ এ খাতে ব্যয় হয়। তাই অধিক পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করতে পারলে অধিক পরিমাণে পণ্য রপ্তানি করা

যাবে। এতে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাবে। রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেলে আমদানি ব্যয়ের সাথে ভারসাম্য ফিরবে এবং কোনো কোনো পণ্য আমদানির পরিমাণ কমে যাবে।

১০. সঞ্চয় ও মূলধন গঠন : দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সঞ্চয় ও মূলধন বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রপ্তানি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায়। এতে জনগণের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত হয় এবং অর্থ সঞ্চয় ও মূলধন বৃদ্ধি পায়।

১১. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি : বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির অন্যতম উপায় হলো রপ্তানি বৃদ্ধি। অধিক পরিমাণে রপ্তানি পণ্য উৎপাদিত হলে দেশের চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়। যত বেশি রপ্তানি করা যাবে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ তত বেশি হবে। এক্ষেত্রে পণ্য আমদানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, তা না হলে রপ্তানিকৃত আয় পণ্য আমদানিতেই শেষ হয়ে যাবে।

১২. বৈদেশিক বাণিজ্যে অবস্থান সুদৃঢ় করা : বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে রপ্তানি পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক। রপ্তানিযোগ্য পণ্যের পরিমাণ অধিক হলে অনেক দেশে পণ্য রপ্তানি করা যাবে। এতে ঐ সকল দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে। বাণিজ্যিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হলে উভয় দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভারসাম্য আনার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। বিশ্বায়নের এই যুগে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য সুলভে নিশ্চিত করতে হবে। এতে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে।

১৩. মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন : পণ্য রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে উৎপাদিত পণ্যের ভালো মূল্য পাওয়া যায়। কেননা, কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারের তুলনায় বিদেশে পণ্য রপ্তানি করলে অধিক মুনাফা পাওয়া যায় এবং উৎপাদনকারীরা আর্থিকভাবে লাভবান হয়। এছাড়া দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, বাংলাদেশে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে মাথাপিছু আয় ছিল ৫৯৮ ডলার যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ১,৬০২ ডলারে। সার্বিকভাবে দেশের প্রায় সকল খাতে উন্নয়ন হওয়ায় মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ার পাশাপাশি ক্রয় সক্ষমতা বাড়ছে।

১৪. বেকার সমস্যা নিরসন : বেকার সমস্যা হ্রাসে রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন এবং সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে বিপুল সংখ্যক কর্মক্ষম লোকের কর্মসংস্থান হবে। কৃষিভিত্তিক শিল্পজাত পণ্যের পাশাপাশি অকৃষিখাতের পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। এতে শ্রমিক, কৃষক এবং শিক্ষিত বেকার সমস্যা অনেক কমে যাবে।

১৫. শিল্প উন্নয়নে সহায়তা : বাংলাদেশ দ্রুত শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সহায়ক ভূমিকা পালন করে। রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেলে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি, কাঁচামালসহ আনুষঙ্গিক পণ্য আমদানির সক্ষমতা বাড়বে এবং নতুন নতুন শিল্প-কারখানা স্থাপন করা সহজ হবে। এছাড়া বিদ্যমান শিল্প-কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে যা অর্থনীতিতে গতিশীলতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

১৬. পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি : রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে। যেসব এলাকায় পণ্য উৎপাদিত হবে সেসব এলাকা থেকে পণ্য পরিবহণের জন্য রাস্তাঘাটের উন্নয়ন করতে হবে। এতে করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পরিবর্তন হবে এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পরিধি বৃদ্ধি পাবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন এবং সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এক্ষেত্রে কৃষিভিত্তিক শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন এবং শিল্পভিত্তিক পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। এলক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রয়োজন কেন? আপনার মতামত দিন।

সারসংক্ষেপ

রপ্তানি আয় বৃদ্ধির উপায় হলো রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি। ক্রমবর্ধিষ্ণু জনগোষ্ঠির বহুবিধ চাহিদা পূরণে প্রতি বছর পণ্য আমদানিতে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ভারসাম্য আনার জন্য রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন ও সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়া জাতীয় আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, নতুন শিল্পের বিকাশ, পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা, সঞ্চয় ও মূলধন গঠন, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রভৃতি কারণেও রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রয়োজন। রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করতে সবাইকে একযোগে কাজ করে যেতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশ অধিক পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে কোন পণ্যটি রপ্তানি করে?
(ক) রাবার (খ) চা (গ) তৈরি পোশাক (ঘ) পাট

২। রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রয়োজন-
i. বৈদেশিক মুদ্রার জন্য ii. জাতীয় আয় বৃদ্ধির জন্য iii. কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন-
i. নতুন শিল্প-কারখানা ii. পর্যাপ্ত কাঁচামাল iii. পরিবহন ব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

আদিকাল থেকে পণ্যের আদান-প্রদান চলে আসছে। কোনো মানুষই স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়ায় প্রয়োজনের তাগিদে এরূপ আদান-প্রদান করে থাকে। যা বর্তমানে বিশ্বব্যাপী মানুষের প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে পরিণত হয়েছে। এক দেশের সাথে অন্য দেশের গড়ে উঠেছে বিশেষ বাণিজ্যিক সম্পর্ক।

ক. বাণিজ্য কত প্রকার ও কী কী?
খ. আমদানি ও রপ্তানি বলতে কী বুঝায়?
গ. বিদেশ থেকে শিল্পজাত পণ্য আনা কোন ধরনের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড এবং কেন? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার শিল্পের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন -২

বাংলাদেশ জনবহুল হওয়ায় বিভিন্ন জনঘাটতি সম্পন্ন দেশসমূহের কাছে বিশেষ কদর রয়েছে। উন্নত দেশগুলো সেখানকার অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ বিভিন্ন কাজে এদেশ থেকে জনশক্তি আমদানি করে থাকে। বিদেশে কর্মরত এই জনশক্তি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করছে। সরকার তাদের কল্যাণে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রেখেছে।

ক. বাংলাদেশ কোন কোন ক্যাটাগরির জনশক্তি রপ্তানি করে?
খ. জনশক্তি রপ্তানি বলতে কী বুঝায়?
গ. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জনশক্তি রপ্তানির ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।
ঘ. জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধিতে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.১ : ১. ক ২. খ ৩. ক ৪. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.২: ১. ঘ ২. ক ৩. গ ৪. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.৩: ১. ঘ ২. ক ৩. ক ৪. ঘ ৫. খ ৬. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.৪ : ১. ক ২. ক ৩. ঘ ৪. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.৫ : ১. গ ২. ঘ ৩. ক ৪. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.৬ : ১. গ ২. ক ৩. ক ৪. গ ৫. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.৭ : ১. ক ২. গ ৩. ক ৪. ঘ ৫. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.৮ : ১. গ ২. ঘ ৩. ঘ